



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 50-57

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.504



মক্তবের পাঠশালা থেকে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়: বঞ্চনা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির ঐতিহাসিক আখ্যান

ড. নয়ন সরকার, স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 14.09.2026; Accepted: 28.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The primary objective of this research paper is to understand the historical transformation from the exclusion of marginalized communities from institutional education in nineteenth-century Bengal to their institutional recognition in the twenty-first century. In the mid-nineteenth century, due to the overwhelming dominance of the caste system, the young Guruchand Thakur (1847-1937) was denied admission to traditional pathshalas (village schools) and was compelled to attend a local *maktab* to acquire his initial literacy. These childhood experiences of social humiliation and alternative education eventually shaped his core social philosophy. Identifying education – rather than conventional religious practice – as the primary instrument of liberation, he spearheaded an unprecedented educational revolution across the rural areas of undivided East Bengal, grounded in the principles of "establishing a school in every home" and the motto: "Work in hand, the Divine Name on the lips; we seek both education and spiritual initiation." From the integrated vision behind the primary school and maktab in Orakandi to the establishment of over a thousand schools across villages, the student hostel movement in the city, and the advocacy for the rights of disadvantaged students during the founding of Dhaka University in 1912 – his wide-ranging movement brought marginalized people to the center of the social structure. As a historical and moral outcome of this long-drawn-out struggle, the 'Harichand Guruchand University' was established in the twenty-first century at Thakurnagar in North 24 Parganas, under the initiative of the Government of West Bengal. Primarily through an analysis of the foundational text Sri Sri Harililamrita and the historical context, this essay attempts to demonstrate that the journey from the maktab in Orakandi to the university in Thakurnagar is not merely the life story of an individual; rather, it stands as a monumental historical record of marginalized people securing social justice, self-respect, and institutional rights in the face of systemic deprivation.

Keywords: Guruchand Thakur, Maktab education, Harichand Guruchand University, Matua education movement, Orakandi, Sri Sri Harililamrita, social justice

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার অদ্ভুত সামাজিক বিচারে। অনেক সময় কোনো একটি যুগের অন্ধকার, অপমান ও বঞ্চনাকে ইতিহাস চিরকালের জন্য ধরে রাখে না; বরং বহু বছর পর সেই

অপমানের মাশুল চুকিয়ে এক পরম আলোর দিশা তৈরি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার গ্রামীণ সমাজে যে সামাজিক ও বর্ণগত ভেদাভেদ ছিল, তা সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের জীবনকে আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকারের স্তরে ঠেলে দিয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে পূর্ববঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে সাধারণ এক কৃষক পরিবারের বালক প্রথাগত পাঠশালায় পড়তে গিয়ে কেবল জাতপ্রথার কারণে বাধার মুখে পড়েছিল। যে চণ্ডাল বা নমশূদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই সমাজে বিদ্যাচর্চা ছিল এক নিষিদ্ধ ফল। অক্ষরের আলো থেকে বঞ্চিত সেই বালকটিকে সেদিন ঠাঁই নিতে হয়েছিল গ্রামের এক মক্তবে।

সেই বালকটি আর কেউ নন, তিনি মতুয়া আন্দোলনের মহান কাণ্ডারী গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭)। জীবনের শুরুতে প্রথাগত পাঠশালার দরজা যাঁর সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যিনি জীবনের প্রথম অক্ষর চিনেছিলেন মক্তবের ধূলিমাখা পরিবেশে— একবিংশ শতকে এসে সময়ের চাকা ঘুরিয়ে ইতিহাস তাঁর সামনেই যেন নতজানু হয়েছে। আজ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়— ‘হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়’।

যাঁকে একদিন বর্ণহিন্দুর পাঠশালা অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, আজ উচ্চবর্ণ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শত শত ছাত্রছাত্রী তাঁরই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর অলিন্দে বসে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের ডিগ্রি অর্জন করছে। এটি কেবল ইট-পাথরের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার গল্প নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, আত্মসম্মান এবং নীরব এক শিক্ষাকেন্দ্রিক রূপান্তরের মহাকাব্যিক জয়গাথা।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই জীবন-সংগ্রামকে বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে তাঁর পিতা, মতুয়া ভাবধারার প্রবর্তক শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের (১৮১২-১৮৭৮) যুগের দিকে। হরিচাঁদ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন যে, অবদমিত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হলে কেবল ভক্তিভাব যথেষ্ট নয়, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ প্রয়োজন। মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান আকর গ্রন্থ তারকচন্দ্র সরকার রচিত ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সেখানে কবি লিখছেন:

"গুরুচাঁদে আজ্ঞা দিল বিদ্যা শিক্ষা দিতে। / বিদ্যা বিনা জীব কভু না পারে তরিতে।"

পিতার সেই অমোঘ নির্দেশকে গুরুচাঁদ ঠাকুর জীবনের চরম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে বিদ্যা সাধারণ মানুষকে সামাজিক অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে না, সেই বিদ্যা নিষ্ফল। তিনি নিজের জীবনের মক্তব-শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা পেয়েছিলেন— বিদ্যার কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বা সামাজিক সীমানা থাকে না; বিদ্যা হলো মানুষের মুক্তির একমাত্র হাতিয়ার।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে অনুধাবন করা যায়, ঔপনিবেশিক বাংলায় ওড়াকান্দির কাদা-মাটির পাঠশালা থেকে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা কতখানি গভীর ও দূরদর্শী ছিল। এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো গুরুচাঁদ ঠাকুরের শৈশবের সেই মক্তব-জীবনের বঞ্চনা থেকে শুরু করে কীভাবে এক বিশাল গণ-শিক্ষা আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এবং কীভাবে সেই আন্দোলনের ধারা আজ একবিংশ শতকের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রূপ লাভ করেছে— তা ঐতিহাসিক ও মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ-সরলভাবে অনুধাবন করা। এটি কেবল একজন মানুষের জীবনকথা নয়, এটি বাংলার সামাজিক ও শিক্ষাজগতের এক অভূতপূর্ব রূপান্তরের দলিল।

জ্ঞানলাভের প্রতি মানুষের সহজাত তৃষ্ণা কোনো সামাজিক প্রাচীর বা বর্ণভেদের নিয়ম মানে না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সামাজিক বাস্তবতায় সেই বিদ্যা অর্জনের পথটি সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য ছিল অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ। বালক গুরুচাঁদের শৈশব কেটেছিল ওড়াকান্দির পল্লিপ্রকৃতির কোলে।

আর দশটি শিশুর মতোই তাঁর মনেও বইয়ের পাতা উল্টানোর, নতুন অক্ষর চেনার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। কিন্তু সেই যুগে গ্রামীণ হিন্দু সমাজ পরিচালিত প্রথাগত পাঠশালাগুলোতে নমশূদ্র বা অস্পৃশ্য সমাজের শিশুদের প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো কারণে প্রবেশ মিললেও তাদের বসতে হতো সভার এক প্রান্তে, মাটিতে অথবা ঘরের বাইরে— যেখানে বিদ্যাগ্রহণের চেয়ে অপমানের লাঞ্ছনাই হতো বেশি।

বালক গুরুচাঁদ ঠাকুর যখন নিজের গ্রামে এই তীব্র সামাজিক বৈষম্যের মুখোমুখি হলেন, তখন তাঁর মনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বর্ণহিন্দুর সমাজ প্রথাগত শিক্ষা থেকে তাদের দূরে রেখে আসলে অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্দি করে রাখতে চায়। কবি তারকচন্দ্র সরকার তাঁদের এই গভীর সামাজিক যন্ত্রণা ও শিক্ষার অভাবকে স্মরণ করে ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ লিখেছেন:

"অজ্ঞান আঁধারে লোক ডুবিয়া মরিল। / বিদ্যা শিক্ষাবিনে কারে জ্ঞান না জন্মিল।"^২

এই অজ্ঞতার আঁধার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে বালক গুরুচাঁদ এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নেন। সামাজিক অবমাননার কাছে নতিস্বীকার না করে তিনি শিক্ষার আলো পাওয়ার জন্য সন্ধান করেন এক বিকল্প অঙ্গনের। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মতোই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল দরিদ্র মুসলিম কৃষক পরিবারগুলো। ওড়াকান্দির কাছেই অবস্থিত স্থানীয় মক্তবটি পরিচালনা করতেন এক দরদী মৌলভি সাহেব। সেখানে জাতপ্রথার এই রূপভেদের প্রাচীর ছিল না। বিদ্যালাভের অদম্য জেদ বুকে নিয়ে বালক গুরুচাঁদ সেই মক্তবেই নিজের নাম নথিবদ্ধ করেন।

মক্তবের সেই ধূলিমাখা পরিবেশে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অক্ষরপরিচয় শুরু হয়। বর্ণহিন্দুর পাঠশালা যা তাঁকে দিতে অস্বীকার করেছিল, সেই অক্ষর চেনার আনন্দ তিনি খুঁজে পান আরবী ও ফারসি হরফের তালিম নেওয়ার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সেখানে মনযোগের সাথে মক্তবের পাঠ গ্রহণ করেন। মক্তবের এই দিনগুলো কেবল গুরুচাঁদের অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়নি, তাঁর চিন্তাজগতেও এক বিরাট রূপান্তর এনে দিয়েছিল।

১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রথম পাঠ: অতি অল্প বয়সেই তিনি বুঝেছিলেন যে, শোষণ ও বঞ্চনার স্বরূপ সব প্রান্তিক মানুষের জন্যই এক। বর্ণহিন্দুর সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম— উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

২. মানবিক মর্যাদার বোধ: মক্তবের অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ তাঁকে শিখিয়েছিল যে, বিদ্যালাভের অধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত সত্য। কোনো সামাজিক পরিচয় দিয়ে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

নিজের জীবনের এই মক্তব-অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমগ্র জীবনের মূল প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। যে বালকটি অক্ষরের অভাবে অপমানিত হয়ে মক্তবের দরজায় কড়া নেড়েছিল, সেদিনের সেই কষ্ট ও জেদই পরবর্তীতে হাজার হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্ম দিয়েছিল। তিনি নিজের ভেতরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যে অবমাননার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে, নিজের সমাজের কোনো সন্তানকে যেন আর সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে না হয়। মক্তবের সেই প্রথম আলোর পথ ধরেই তিনি তৈরি করেছিলেন এক সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর।

একজন মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কীভাবে একটি গোটা জাতির মুক্তির দিশা হয়ে উঠতে পারে, গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শৈশবে প্রথাগত পাঠশালা থেকে বিতাড়িত হয়ে মক্তবের শরণাপন্ন হওয়ার যে তিক্ত ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, তা তাঁকে কেবল ব্যথিত করেনি— বরং তাঁর ভেতরে এক বৈপ্লবিক সামাজিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল। তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে যদি চিরকাল অক্ষরজ্ঞানহীন করে রাখা যায়, তবে তাদের সহজে শোষণ করা সম্ভব। তাই জাতপ্রথার

অমানবিক শিকল ভাঙতে হলে এবং আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার বিকল্প অন্য কিছুই হতে পারে না।

নিজের জীবনের এই উপলব্ধি থেকেই গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভাবধারাকে কেবল ধূপ-দীপ বা উপাসনার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে একটি সামাজিক ও শিক্ষাকেন্দ্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে অশিক্ষা মানুষকে নিজের অধিকার ভুলিয়ে দেয়, সেই অশিক্ষাই হলো সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ব্যাধি। কবি তারকচন্দ্র সরকার ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ গুরুচাঁদের এই মহান সামাজিক আকুলতা বর্ণনা করে লিখেছেন:

"ঘরে ঘরে পাঠশালা করো গো স্থাপন। / বিদ্যা বিনে নহে কেহ মানুষের মতন ॥"^৩

এই কালজয়ী আহ্বানের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ধর্মচর্চার পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে পাঠশালা গড়ে তুলতে হবে। তিনি প্রথাগত ধারণাকে আমূল বদলে দিয়ে বলেছিলেন— উপাসনালয় বা মন্দির গড়ে তোলার চেয়েও বড় পুণ্য হলো কোনো অবদমিত শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়া।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নতুন সমাজভাবনার মূল ভিত্তি তৈরি হয়েছিল তাঁরই বিখ্যাত কালজয়ী স্লোগানের ওপর— "হাতে কাম মুখে নাম, শিক্ষা দীক্ষা চাই"^৪। এই সহজ বাণীটির গভীরে লুকিয়ে ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও জীবনমুখী এক দর্শন:

১. **শ্রমের সম্মান ("হাতে কাম"):** তিনি বিশ্বাস করতেন যে দৈনন্দিন কৃষি বা কায়িক শ্রম কোনো লজ্জার বিষয় নয়। বেঁচে থাকার জন্য নিজের হাতে কাজ করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি।

২. **আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা ("মুখে নাম"):** ঈশ্বরের নাম বা ভক্তি মানুষকে আত্মিক শক্তি ও নীতিবোধ দান করে, যা মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করে।

৩. **বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও আত্মসম্মান ("শিক্ষা দীক্ষা চাই"):** কেবল কাজ আর ভক্তি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় না; সামাজিক মর্যাদা ও সচেতনতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সুদীক্ষা অপরিহার্য।

নিজের জীবনের বঞ্চনা থেকে জন্ম নেওয়া এই চিন্তা কোনো তত্ত্বকথা ছিল না, বরং তা ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মেলানো এক সহজ বাস্তবমুখী পথ। তিনি পিতা-মাতাদের সচেতন করে বলেছিলেন, নিজেরা না খেয়ে থাকলেও যেন সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায়। তিনি বুঝেছিলেন যে সমাজ একদিন তাঁকে পড়তে দেয়নি, সেই সমাজের প্রতিটি ঘরের দরজায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই হবে তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। মক্তবে অর্জিত যে অক্ষরচেতনার বীজ তাঁর শৈশবে রোপিত হয়েছিল, তাই এবার এক মহীরুহে রূপ নিতে শুরু করেছিল।

ওড়াকান্দির বুকে প্রথম পাঠশালা ও মক্তবের সমন্বিত পরীক্ষার পর গুরুচাঁদ ঠাকুর থেমে থাকেননি। তিনি বুঝেছিলেন, শিক্ষার আলো যদি কেবল একটি গ্রামে আলো জ্বালিয়ে রেখে ক্ষান্ত হয়, তবে তা সমগ্র দেশের অন্ধকার দূর করতে পারবে না। নিজের মক্তব জীবনের বঞ্চনাকে তিনি এমন এক শক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন, যা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল তৎকালীন অবিভক্ত পূর্ববঙ্গের গ্রাম থেকে গ্রামে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৮০-এর দশকের পর থেকে ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, বাকেরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শুরু হয় এক গণ-শিক্ষাবিস্তারের কাজ। কোনো সরকারি সাহায্য বা ধনকুবেরের অনুদানের অপেক্ষায় বসে না থেকে সাধারণ কৃষক, দিনমজুর ও শ্রমজীবী মানুষ নিজেরা একজোট হয়েছিল। তাঁরা নিজেদের খেতের বাঁশ, টিন ও ছন তুলে এনে গ্রামের পর গ্রামে গড়ে তুলেছিল হাজার হাজার

প্রাথমিক বিদ্যালয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে কাদা-জল পেরিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হেঁটে গেছেন। তিনি অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করে হাত জোড় করে বলতেন— সন্তানকে মাঠের কাজে আটকে না রেখে স্কুলে পাঠান। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই যুগের সামাজিক কুসংস্কার ভেঙে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন। দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যেও বাবা-মায়েরা যাতে সন্তানদের পড়ালেখা চালিয়ে যান, সেই জন্য ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ কবি তারকচন্দ্র সরকার গুরুচাঁদের বাণীকে পরম দরদে ধরে রেখেছেন:

"অল্প বস্ত্র কষ্ট হয় তাহাও সহিবে। / সন্তান সন্ততিগণে বিদ্যা শিক্ষা দিবে॥"^৫

এই একটি পংক্তির মধ্যই প্রকাশ পেয়েছিল একজন সমাজসংস্কারকের কতটা গভীর মানবিক মমতা ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি। তিনি জানতেন পেটের ক্ষুধা কতটা তীব্র, কিন্তু তার চেয়েও তীব্র যে আত্মসম্মানের ক্ষুধা, তা একমাত্র শিক্ষাই মেটাতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে ছাত্ররা যখন হাইস্কুলে বা কলেজে যাওয়ার মতো যোগ্য হয়ে উঠল, তখন আবার নতুন বাধা এসে দাঁড়াল। শহরকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলোতে গ্রামের নির্বন পরিবারের ছেলেদের থাকার জায়গা ছিল না। অস্পৃশ্যতার কারণে শহরের মেসে বা বোর্ডিংয়ে তাদের ঠাই হতো না।

এই সামাজিক সংকট দূর করতে ১৯০৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ‘নমশূদ্র হিতকৈষিণী সভা’। এটি কেবল একটি সংগঠন ছিল না, এটি ছিল প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের এক প্ল্যাটফর্ম। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট দাবি জানান:

- ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশালের মতো জেলা শহরগুলোতে অবদমিত ও গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি খরচে ছাত্রাবাস (হোস্টেল) তৈরি করতে হবে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রামের ছাত্রদের জন্য বিশেষ আর্থিক ছাড় ও বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

তাঁর এই সংগঠিত চাপের মুখে পড়ে তৎকালীন বাংলা সরকার জেলা শহরগুলোতে হোস্টেল নির্মাণ করতে বাধ্য হয়, যার ফলে হাজার হাজার গ্রামীণ ছাত্র প্রথমবার শহরে এসে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাবিস্তারের দূরদর্শিতার চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে ১৯১২ সালে, যখন ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ‘নাথান কমিশন’ গঠন করে। গুরুচাঁদ ঠাকুর কেবল গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেই নিজের ভাবনায় ইতি টানেননি; তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সাধারণ ও অবদমিত ঘরের ছেলেরা পৌঁছাতে না পারে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় তারা পৌঁছাবে না।

তিনি কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানান— নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন অনগ্রসর ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের ভর্তি, বাসস্থান ও বৃত্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও আসন সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়।

ওড়াকান্দির কাদা-মাটির এক মক্তব থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ব্রিটিশ ভারতের উচ্চশিক্ষার অলিন্দে এসে কড়া নেড়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রমাণ করেছিলেন— সঠিক নেতৃত্ব এবং অদম্য জেদ থাকলে একসময় অধিকারবঞ্চিত মানুষও শিক্ষাব্যবস্থার নীতিনির্ধারণী স্তরে প্রভাব ফেলতে পারে।

সময় কখনো স্থির থাকে না; তবে স্মৃতির পলি জমতে জমতে সে একদিন ইতিহাসকে তার প্রকৃত পাওনা ফিরিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ওড়াকান্দির বুকে প্রথাগত পাঠশালা থেকে বহুস্তরিত এক বালকের মক্তবে গিয়ে বর্ণ চেনার যে নিঃশব্দ সূচনা হয়েছিল, একবিংশ শতাব্দীতে এসে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনা

জেলার ঠাকুরনগরে তা লাভ করেছে তার পরম পরিণতি। প্রাক-প্রাথমিক পাঠশালা থেকে শুরু হওয়া সেই সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে আজ স্বমহিমায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে— ‘হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়’।

যে মানুষটিকে একদিন তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ অক্ষরের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল, যার প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বলতে ছিল কেবল মক্তবের প্রাথমিক তালিম, একবিংশ শতকে এসে এক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই নামে উৎসর্গিত হওয়া—এটি কোনো সাধারণ প্রশাসনিক ঘটনা নয়। এটি ইতিহাসের এক অমোঘ, সুন্দর এবং পরম সামাজিক ন্যায়বিচার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীতে ঠাকুরনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শেরই এক জীবন্ত প্রতীক। যে ঠাকুরনগরের মাটি মতুয়া আন্দোলনের আত্মপরিচয় ও সামাজিক জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু, সেই মাটিতেই আজ দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার আলো গ্রহণ করছে।

কবি তারকচন্দ্র সরকার ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ গুরুচাঁদ ঠাকুরের যে দূরদর্শী শিক্ষাভাবনার কথা লিখেছিলেন:

"বিদ্যা শিক্ষা করি লেখে হস্তের অক্ষরে। / মূর্থ জন সদা কাঁদে জ্ঞান নাই হেরে।"৬

আজ সেই বিদ্যার আলো কেবল হস্তের অক্ষরে সীমাবদ্ধ নেই; তা ছড়িয়ে পড়েছে উচ্চতর গবেষণাগার, আধুনিক পাঠাগার এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও তথ্যপ্রযুক্তির শ্রেণীকক্ষে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত এই অঙ্গনে বসে আজ যখন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস কিংবা সাহিত্যের ছাত্ররা গবেষণা করে, তখন তারা আসলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের রোপণ করা সেই শতবর্ষী বৃক্ষেরই ফল আহ্বাদন করে।

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে পৌঁছানো' (Margin to Center), গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয় তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

- **সামাজিক মর্যাদা:** একসময় সমাজের উচ্চবর্ণ শিক্ষার একক কর্তৃত্ব নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আজ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষ্য অলিন্দে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ, হিন্দু, মুসলিম—সব সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী পাশাপাশি বসে জ্ঞানচর্চা করছে।
- **অধিকারের জয়:** যে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে একদিন প্রথাগত বিদ্যার আসন থেকে সরিয়ে মক্তবের দরজায় পাঠাতে হয়েছিল, আজ রাষ্ট্র তাঁর নামে শিক্ষাপীঠ গড়ে তুলে যেন সেই অতীতের ঐতিহাসিক ভুল ও অবমাননার প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর কেবল বইয়ের পাতায় বন্দি বিদ্যা চাননি; তিনি চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা, যা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যও কেবল ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং প্রান্তিক ও সাধারণ পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। গুরুচাঁদের 'হাতে কাম মুখে নাম, শিক্ষা দীক্ষা চাই'— এই দর্শনই যেন আজ আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিধ্বনিত হয়।

ওড়াকান্দির কাদা-মাটির পাঠশালা ও মক্তব থেকে ঠাকুরনগরের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উত্তরণ প্রমাণ করে— সামাজিক বাধার দেওয়াল যতই উঁচু হোক না কেন, সত্য ও মানবিক অধিকারের লড়াই একদিন না একদিন তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছায়। এটি কেবল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প নয়; এটি অবদমিত এক বিশাল জনগোষ্ঠীর শতাব্দীপ্রাচীন লড়াইয়ের প্রাতিষ্ঠানিক মুকুট।

ইতিহাসের গতিপথের দিকে তাকালে দেখা যায়, মহান বিপ্লব কিংবা পরিবর্তনের সূচনা সবসময় বিশাল প্রাসাদ বা আধুনিক অট্টালিকা থেকে হয় না; অনেক সময় তা শুরু হয় সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও

ধূলিধূসরিত কোনো এক সাধারণ কুটির থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওড়াকান্দির বুকে বালক গুরুচাঁদের প্রথাগত পাঠশালা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাটি তৎকালীন বর্ণভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কাছে হয়তো অত্যন্ত সাধারণ ও তুচ্ছ একটি বিষয় ছিল। কিন্তু সেই অপমান ও বঞ্চনা যে একবিংশ শতকে এসে বাংলার সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মানচিত্রকে আমূল বদলে দেবে— সেদিন তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরে অবস্থিত ‘হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়’-এর সুবিশাল ফটক ও শ্রেণীকক্ষগুলোর দিকে তাকাই, তখন কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে না; চোখে পড়ে এক মানুষের অদম্য জেদ, নীরব আত্মত্যাগ এবং শতাব্দীজুড়ে প্রবাহিত সামাজিক পরিবর্তনের এক পরম সত্য রূপ। প্রথাগত শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে যে বালকটিকে একদিন পরম আশ্রয়ে মক্তবের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছিল, সময় ও ইতিহাস আজ তাঁরই চরণে সমস্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

কবি তারকচন্দ্র সরকার ‘শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত’-এ গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার মূল দর্শন ও জীবনসংগ্রামের যে সুগভীর রূপরেখা রেখে গেছেন, তা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে:

"জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা শিক্ষা এই তিন সার। / গুরুচাঁদ নাম ডাকি তরি যাও পার।"^১

এখানে ‘তরি যাও পার’ কেবল কোনো অলৌকিক বা পারমার্থিক মুক্তির কথা বলে না; তা বলে শিক্ষার আলো দিয়ে সমাজ থেকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অস্পৃশ্যতা ও দাসত্বের অন্ধকার পেরিয়ে আত্মসম্মানের তীরে পৌঁছানোর কথা। গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, বর্ণ বা অভিজাত শ্রেণীর একচ্ছত্র সম্পত্তি হতে পারে না। বিদ্যা হলো সেই সর্বজনীন অধিকার, যা প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার বীজ বপন করে।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই রূপান্তরমুখী জীবনগাথা আমাদের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত চিরন্তন ও সুদূরপ্রসারী সত্য শিক্ষা দিয়ে যায়। জীবন আপনাকে যেখানে থামিয়ে দিতে চায়, সেখান থেকেই এক নতুন পথের সূচনা করা সম্ভব। বর্ণহিন্দুর পাঠশালা গুরুচাঁদকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনি শিক্ষার তৃষ্ণাকে বিসর্জন না দিয়ে মক্তবে গিয়ে বর্ণ পরিচয় করেছিলেন। এই শিক্ষা আমাদের শেখায়— বাধার দেওয়াল যতই শক্ত হোক না কেন, বিদ্যার আলো পাওয়ার অদম্য ইচ্ছা থাকলে পথ খুঁজে নেওয়া যায়। নিজের শৈশবের কষ্টকে তিনি ব্যক্তিগত আক্ষেপ বা ক্ষোভ বানিয়ে রাখেননি; বরং তাকে রূপ দিয়েছিলেন এক বিশাল গণ-শিক্ষা আন্দোলনে। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যেন তাঁর সমাজের কোনো সন্তানকে আর অনাহারে বা শিক্ষার অভাবে অস্পৃশ্য হয়ে বাঁচতে না হয়। ওড়াকান্দির বাঁশ-ছনের তৈরি পাঠশালা ও মক্তব থেকে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন আজ ঠাকুরনগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিয়ে প্রমাণ করেছে— ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিচার শেষ পর্যন্ত ঘটে সত্য, সমতা ও শিক্ষাকেন্দ্রিক সংগ্রামের হাত ধরেই। আজকের একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাভাবনার যুগে দাঁড়িয়েও গুরুচাঁদ ঠাকুরের “হাতে কাম মুখে নাম, শিক্ষা দীক্ষা চাই”— এই কালজয়ী দর্শন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি শ্রম ও শিক্ষার যে অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, তা আজও আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষার প্রেরণা। ওড়াকান্দির কাদা-মাটির সেই ধূলিধূসরিত বালকটি আজ আর কেবল একটি নাম কিংবা একটি ইতিহাসের অধ্যায় নন; তিনি বাংলার শিক্ষাজগৎ, সামাজিক সমতা ও অবদমিত মানুষের সার্বিক মুক্তির ইতিহাসে এক চিরভাস্বর ও অক্ষয় আলোকবর্তিকা। ঠাকুরনগরের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অলিন্দে, প্রতিটি গবেষণার পাতায় তাঁর সেই মুক্তিসংগ্রামের সুর চিরকাল প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১২৫।
২. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৩০।
৩. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৩৫।
৪. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৪০।
৫. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৪৮।
৬. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৫২।
৭. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০, পৃ. ১৬০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, সিকান্দার। অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলন। দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
২. বিশ্বাস, রতন। মতুয়া ধর্ম ও গুরুচাঁদ ঠাকুর: নিম্নবর্গের আত্মপরিচয়। কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৫।
৩. মন্ডল, বীরেন। অনগ্রসর সমাজ ও শিক্ষা আন্দোলন। সাহিত্য প্রকাশ, ২০২১।
৪. মজুমদার, প্রসূন। বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিহাস। দীপ প্রকাশন, ২০১৭।
৫. সরকার, তারকচন্দ্র। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত। শ্রীধাম ওড়াকান্দি সংস্করণ, মতুয়া মহাসঙ্ঘ, ২০০০।
৬. সরকার, সুমিত। আধুনিক ভারতের সামাজিক ও সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলন। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০২।